দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষানীতির বিভ্রান্তি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

মামুনুর রশীদ

অতি সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে যে ক'টি সমস্যা খুব বেশী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। নিঃসন্দেহে তার একটি হচ্ছে শিক্ষা সমস্যা। শিক্ষা ক্ষেত্রে জমে ওঠেছে অসংখ্য সমস্যার স্তূপ। এটা ভাববার কারণ নেই যে, এগুলো দু'চার বছরে জমে ওঠেছে এবং দু'চার বছরে তো বটেই, দু'চার দশকেও এই সমস্যাগুলো দূর করা নিশ্চিতই একটা দুরূহ কাজ। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে সে সমস্যাগুলো শিক্ষানীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর পেরিয়ে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আচ্ছন্ন করে আছে। চারদিকেই কেমন একটা ভুতুড়ে অন্ধকার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেখান থেকে আশু মুক্তির কোন সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। অতএব ব্যাপারটা যে কোন সচেতন ব্যক্তিমাত্রকেই না ভাবিয়ে পারে না।

আজকে দেশের বিভিন্ন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে (মেদ্রাসাসহ) পড়ালেখা করছে তাদের দিকে তাকালে সুখী ও সুন্দর ভবিষ্যতের কল্পনা করা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সে কষ্টের গভীর কারণ আছে। দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ালেখা করছে, এ কথা নিশ্চিত যে, ওদের মধ্য থেকেই বের হয়ে আসছে আগামী দিনের ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, গবেষক, প্রশাসক, শিল্পীসহ দেশের এলিটরা। কিন্তু প্রকৃত মানুষ বের হয়ে আসতে পারবে ক'জন। আমরা সবাই-ই বোধ হয়, এ প্রশ্নের উত্তরটা কমবেশ জানি। আজকে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার গভীর আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করা উচিত যে, জীবজগতে মানুষ নেহাতই কোন আকস্মিক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়- সে আশরাফুল মখলুকাত- এ পৃথিবীতে আল্লাহর সম্মানিত প্রতিনিধি। এবং আসলে প্রত্যেকটি শিক্ষানীতির এটিই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, মানব শিশু কর্মক্ষেত্রে যে পেশায়ই থাকুক, কিন্তু সে প্রকৃত মানুষ হবে। এমন মানুষ যে পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে সৎ ও নিষ্ঠাবান; এমন মানুষ যে হৃদয়বান ও প্রেমিক এবং প্রয়োজনবোধে নির্মম ও কঠোর, এমন মানুষ যে বিচারবুদ্ধিহীনভাবে অন্ধের মতো পথ চলবে না, এমন মানুষ যে উচ্চাভিলাষী কিন্তু ত্যাগী এবং সে মানুষ হবে আল্লাহর কাছে নিজ নিজ প্রত্যেকটি কাজের জবাবদিহি চেতনায় সতর্কিত এবং সে অনুভূতিতে ভাস্কর ও দীপ্র। নিরন্তর শ্রেয়োবোধে উদ্দীপ্ত সেই মানবসত্তা এভাবেই সততা; নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবে প্রকৃত মানুষরূপে।

কিন্তু কাজটা সহজ তো নয়ই, অনেকে অসম্ভব ও অবাস্তব মনে করে বসতে পারেন। বলার কিছু নেই; পশ্চিমা একপেশে বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষানীতির প্রভাব আমাদের 'ব্রেইন ওয়াশ ও আই ওয়াশ' সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে বহু আগেই। এগুলোর বাইরে মৌলিক চিন্তা করার শক্তি আমাদের আছে কি? সে জন্য প্রয়োজন, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং সে পরিকল্পনার নিয়ম ও শৃংখলামাফিক ক্রমশ যথাযথ বাস্তবায়ন।

এ কথা তো সত্য যে, ফি-বছরই আমাদের দেশে বেরিয়ে আসছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, আইনজীবীসহ এমন কিছু 'মানবসম্পদ' যারা একটা দেশের বিশেষ করে মানব কল্যাণের সাথে প্রায় সরাসরি সম্পৃক্ত হবার অলিখিত দায়বদ্ধতা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বের হচ্ছেন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ও শিক্ষকতায় যাবার যোগ্যতা নিয়ে অসংখ্য তরুণ-তরুণী। অন্তত আমাদের মতো দেশে এরা যদিও আগে থেকে বলতে পারেন না, ঠিক কোন পেশায় ঢুকবেন, তবু ধরে নেয়া যেতে পারে, এরা সরকারী বা বেসরকারী কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করবেন। অথবা পুঁজির প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যবসায় নামবেন। আর শিল্পী লেখক তো থাকতে পারেন বিভিন্ন পেশাজীবী থেকে। আছেন সাংবাদিক, রাজনীতিবিদসহ শিক্ষিত সমাজের একাংশ, যাদের প্রত্যেকেরই দেশ ও জাতির প্রতি একটা কমিটমেন্ট থাকে। বলা হয়ে থাকে, এরাই প্রকৃত মানব সম্পদে খেটে খাওয়া নিম্নবিত্তের মানুষ এবং অধিকাংশই কৃষিজীবী কিংবা কৃষিনির্ভর প্রান্তিক চাষী। বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কর্মরত আছেন দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিক কর্মচারীরা।

আমাদের জনসংখ্যার এই চালচিত্রকে সামনে রেখে, ভাবুন তো, আমরা কোন পথে এগুচ্ছি। দু'দশজন যে ব্যতিক্রম নেই, তা নয়, কিন্তু আমরা যে যে পেশায়ই আছি; তাদের অধিকাংশই কি দুর্নীতির দুষ্টচক্রে নিমজ্জিত নই? ডাক্তার হাসপাতালে দায়িত্ব পালনে অপ্রেমিক, প্রকৌশলী ঠিকাদারদের সাথে ঘুষের টাকা বন্টনে ব্যস্ত, শিক্ষক সুকৌশলে ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছেন এবং ক্লাস নিলেও যেনতেন প্রকারে; কৃষিবিদ সুদূর গ্রামে গিয়ে ফসলের রোগ সনাক্তকরণে অপারগ; প্রশাসক বামহাতের কাজ সারছেন সন্তর্পণে, আইনজীবী মিথ্যের পক্ষে বক্তব্যের চতুরালী করছেন; ব্যবসায়ী ক্রেতাসাধারণের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অধিক মুনাফা লুণ্ঠনে ব্যস্ত, সাংবাদিক মগ্ন হলুদ সাংবাদিকতায়, রাজনীতিবিদ আত্মপ্রেমে বিভোর, বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই ভাড়া খাটছেন বিবেক-বর্জিতভাবে; লেখক ও শিল্পী ক্রমশ মজ্জমান পর্নোগ্রাফীর বিপজ্জনক ভুবনে। প্রত্যেকেই যুক্তি দেখাবেন, অভাব অনটন ঘোচাতে বাড়তির প্রয়োজন; যুক্তি দেখাচ্ছেন- জীবন যেখানে যে রকম সে রকমই চলতে হয়। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এই ধরনের অতিসরলীকৃত কৈফিয়ত সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মনে রাখা উচিত,

জঘন্যতম অপরাধীরও আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য আছে। এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করলেই সবসময় আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পায় না। তার মানে আমাদের নৈতিকতার মান ক্রমহ্রাসমান।

অনস্বীকার্য যে, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ মানুষের ভেতরকার মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলোকে নষ্ট করার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ব্যক্তি নিয়েই তো সমাজ এবং সে ব্যক্তিকে গড়ে তোলার পদ্ধতি অর্থাৎ শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কোথাও না কোথাও ত্রুটি আছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রদান করার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে সে ত্রুটি দূর করা উচিত। এতে করে শিক্ষার্থীর চেতনায় একটা নৈতিকতার জন্ম হবে মানব চৈতন্যে। স্মরণ রাখা উচিত, নৈতিকতা জিনিসটা মানব চৈতন্যে আপনা থেকেই জন্ম নেয় না, বহুলাংশেই কিংবা নাস্তিক্যবাদী চেতনায়ও একটা নৈতিক চেতনার জন্ম হতে পারে, কিন্তু মনে রাখা উচিত সেটা হবে কেবলই ইহ জাগতিক। প্রকৃতপক্ষে মানবশিশুর মধ্যে ইহজাগতিক জ্ঞান প্রদান করার সাথে সাথে পর জগতেও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এতে করে মনের মধ্যে দুটো ভয়ের জন্ম হবে- এক ঃ রাষ্ট্রীয় আইনকে অবজ্ঞা করলে ধরা পড়ে জবাব দেবার ভয়; দুই ঃ সর্বজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর কাছে জবাব দেবার ভয়। বস্তুত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভয়টি মানব চেতনায় থাকলে, প্রথম ক্ষেত্রে কোথাও ফাঁকি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। এটি হচ্ছে এক ধরনের নিরন্তর শ্রুত বজ্রধ্বনি, যেখানে মানুষ বারবারই অনুভব করে সেই কথাটি ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একদিন ফিরে যেতে হবে এবং প্রত্যেকটি কাজের জবাব দিতে হবে।' সেদিন রিক্সা করে কলেজে আসার সময় বুড়ো রিক্সাওয়ালা সবিনয়ে আমাকে অনুরোধ করে, 'স্যার, আপনার ছাত্রদেরকে একটু বলে দেবেন; ওরা যেন একই রিক্সায় চার জন না বসে; আর যদি বসেইবা, ভাড়াটাও যেন সে রকম দেয়।' আমি নির্লিপ্তভাবে বলি ঠিক আছে বলবো। বেশ কিছুদিন আগে পত্রিকায় পড়লাম, ঢাকার কোন একটি কলেজের ছেলেরা একজোট বেঁধে বিনে পয়সায় একটি জনপ্রিয় সিনেমা দেখার জন্য মালিককে বাধ্য করেছে। এ নিয়ে পুলিশের সাথে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এ ধরনের ঘটনা দেখতে দেখতে এবং পড়তে পড়তে আমাদের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন, কলেজ পড়ুয়া এ সমস্ত তরুণ ছেলেদের প্রেমহীন ও বিবেক-বর্জিত আচরণের উৎসটা কোথায়? জানি, অনেক সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে সেজন্য। কিন্তু অনস্বীকার্য সত্যটা কি এই নয় যে, তাদের ভেতরে অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আদৌ জন্মেনি; এবং কারো কাছেই কোন জবাবদিহিতার বোধ অনুপস্থিত। অতএব যা হবার তা হচ্ছে, মানব অস্তিত্বের হন্তারক এক শক্তিশালী ডাইনোসার তার রোমশ হাত দিয়ে টালমাটাল করে দিচ্ছে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর আদিগন্ত বিস্তৃত মানব জমিনকে। ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি।

আমাদের শিক্ষানীতিগুলো ঠিক কোন ধরনের Product চাচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। এটা কখনো টু-ইন-ওয়ান, কখনো বা থ্রি-ইন-ওয়ান। কখনো ধর্মনিরপেক্ষ, কখনো ইসলামী এবং কখনো বা নাস্তিক্যবাদী। একটা হওয়া উচিত। আমাদের শিক্ষানীতিই বলে দিক; আমরা কোন ধরনের মানবসম্পদ উৎপাদন চাই। শিক্ষা যদি হয়, ব্যক্তি ও সমাজ পরিবর্তন করে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম, তাহলে অনতিবিলম্বে সেই কাঠামো ঠিক করে নিতে হবে। মানবশিশু তো সেই সম্পদ যে সম্পদ অফুরন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সাথে তার পার্থক্য অবিশ্বাস্য রকম মৌলিক। তার মধ্যে অঢেল সৃষ্টিশীলতা আছে; সেটাকে জাগিয়ে দিয়ে তাকে উজ্জীবিত করতে হবে। এটা নির্ভর করছে তাকে কিভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে, সে পদ্ধতির ওপর। মানব সন্তানের মর্যাদা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে তো দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে- 'ও লাক্বাদ কাররামনা বানি আদামা'- নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মহত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছি। এবং যথোপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই সে মর্যাদাকে discover করা যায়।